47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ॥ কলেজ

ভর্তি পরীক্ষা ও কতিপয় প্রস্তাব

দৈনিক জনকণ্ঠ

সৌরভ সিকদার

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন কলেজসমূহে প্রতিবছর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। আগে এই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। সে ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আয় করার সুযোগ পেত। ঢাকার কলেজসমূহ তো ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র বিক্রি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। গতবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশ জারি করে এই জ্বর সারাবার জন্য যে কুইনাইন দিয়েছে তাতে জ্বর সারছে বটে, কিন্তু এখন কুইনাইন কে সারাবে কে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক এবং যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রথমে দেখা যাক এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল। খুব সাদা চোখে দেখলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোচিং নির্ভর হয়ে পড়ছিল। অভিভাবকদের শুধু অর্থদণ্ডই নয়, শিক্ষাকে পণ্য করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত কোচিং ব্যবসায়ীদের হাত থেকে উদ্ধার করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে কলেজগুলোকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য গৃহীত অযৌক্তিক অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখা এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। সরকারী নতুন সিদ্ধান্তের কারণে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শর্ষের ভূত পালায়নি। বরং নতুন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। পূর্বে যে ছাত্র ঢাকার কোন কলেজে ভর্তির জন্য কমপক্ষে পাঁচটি আবেদন করত তার ব্যয় হতো পাঁচ শ' টাকা। বর্তমানে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় তা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে তাকে যোগ্য বলে ঘোষণা দেয়ার কারণে অনেক প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়াই একজন ছাত্রের প্রকৃত মেধার পরিচয় নয়।

তাই যদি হয় তবে যে সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল চলে দেদারসে, সেখানে যারা পরীক্ষায় অর্জন করছে উচ্চ নম্বর, তাদেরকেই মেধাবী হিসাবে শনাক্ত করতে হয়। আর যেহেতু মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ফেয়ার এক্সজাম' হওয়ার সুযোগ কম, কাজেই গণটোকাটুকির সম্ভবনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক দেয়া নম্বরপত্রই যথেষ্ট নয়। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্তে এখানেই ফাঁকটি রয়ে গেছে। আপাতভাবে অভিভাকদের কোচিং সেন্টার এবং কলেজে দেয় অর্থের বোঝা থেকে মুক্ত করা হলেও তার সন্তানের যথার্থ মেধা যাচাই হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে ভর্তি বিষয়ক কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করছি ঃ

ক. ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রের মূল্য ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ টাকা করা যেতে পারে।

খ. বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞানসহ বিষয় ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

গ. লিখিত পরীক্ষা হবে ১ ঘণ্টার। পঞ্চাশ নম্বরের মধ্যে ৫০টি প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রশ্নের একাধিক সেট থাকবে অবশ্যই।

ঘ. ৫০ নম্বরের লিখিত এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় করে মোট এক শ' নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের মেধা তালিকা তৈরি করা সম্ভব।

ঙ. ঢাকাসহ বড় বড় শহরের কলেজে একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং ভর্তি সম্পন্ন করা।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের এক বিরাট অংশ প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই প্রকৃত মেধাবী ছাত্রটি যাতে সে সুযোগ পায়, তার জন্য ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে, এই সুযোগ নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো যেন মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রভর্তির পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কলেজসমূহ। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির চাপের কারণে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে রাতারাতি অসংখ্য কলেজ গড়ে উঠেছে। যেহেতু সরকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে আসা বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদেরকে কলেজে পড়ার সুযোগ দিতে পারছে না যদিও সরকারী ঘোষণায় বার বার বলা হচ্ছে এবং জোর দিয়েই বলা হচ্ছে, শিক্ষা-বাজেট বৃদ্ধি এবং সুযোগ বৃদ্ধির কথা, কাজেই প্রায়ভেট কলেজ খোলার গণপ্রক্রিয়াকে যে উৎসাহিত করা হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এ কারণেই অথবা বলা যায় এর সুযোগ নিয়ে বেঞ্চ-টেবিল-ক্লাসরুমশূন্য এমনকি পর্যাপ্ত শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও অসংখ্য কলেজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে যাচ্ছে। আর এ সবই হচ্ছে মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কি লাভ করবে তা নিয়ে শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তাদের নিঃসন্দেহে ভাবা উচিত। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে কলেজের ক্যাম্পাস ও একাডেমিক ফ্যাসিলিটিজ পর্যবেক্ষণ করে তারপর অনুমোদন দেয়া উচিত। অন্যথায় পরিত্যক্ত হাসপাতালের কক্ষে, বাড়ির ছাদে অথবা প্রধান সড়ক সংলগ্ন দোকান ঘরকে শ্রেণীকক্ষ করে কলেজ গজিয়ে উঠবে। শুধু উঠবে নয়, ইতোমধ্যেই ঢাকা শহরের অনেক কলেজ এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং বড় টাকার অঙ্কের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে লেখাপড়া ব্যবসায় অবলীলায় ভেজাল চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাইভেট কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি ও বেতনের ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা উচিত। নীতিমালা না থাকার কারণে কলেজগুলো তাদের ইচ্ছা মতো বিদেশী নাম এবং ইংরেজী মাধ্যমের মুখোশ লাগিয়ে অসহায় অভিভাকদের পকেট খালি করছে।

সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতনের আশি ভাগ টাকা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে যায়। কাজেই জনগণের অনেক কষ্টের এই টাকার যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না, শিক্ষক নামধারী শিক্ষা ব্যবসায়ীরা লুটে খাচ্ছে, সে দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।